INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 3, MARCH 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্রের প্রাধান্য: জীবনানুভূতি, মনস্তত্ত্ব ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে একটি বিশ্লেষণ

কাঞ্চন পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সোনাদেবী বিশ্ববিদ্যালয়
পূর্ব সিংভুম, ঝাড়খণ্ড, ভারতবর্ষ
SACT, Department of Bengali, THLH Mahavidyalay, Birbhum

Abstract:

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নারীচরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক উপাদান। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র ক্রমশ আদর্শবাদী সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বাস্তব জীবন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। এই ধারার এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারীচরিত্র কেবল কাহিনির সহায়ক উপাদান নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে কাহিনির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থিত। বর্তমান প্রবন্ধে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্রের উপস্থিতি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি, বিশেষত মাতৃপ্রভাব, এবং সমকালীন সমাজবাস্তবতা কীভাবে তাঁর সাহিত্যিক কল্পনায় নারীচরিত্র নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে তা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে তাঁর নারীচরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী, মনস্তাত্ত্বিকভাবে জটিল এবং গভীর মানবিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধ।

Keywords: সন্তোষকুমার ঘোষ, নারীচরিত্র, বাংলা কথাসাহিত্য, সমাজবাস্তবতা, মাতৃত্ব, মনস্তত্ত্ব

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। সমাজে যে পরিবর্তন, সংঘাত এবং মানবিক অভিজ্ঞতা বিদ্যমান থাকে, সাহিত্য সেইসব অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপে প্রকাশ করে। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নারীচরিত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ সংকলনের 'নরনারী' রচনায় সমীর নামক চরিত্রটির মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- " বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান।"[১] শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, বঙ্গসমাজেও নারীর এইরূপ অবস্থান। কারণ সাহিত্য তো আকাশ থেকে পড়ে না, তা সমাজেরই দর্পণ। তাই বাংলা সাহিত্যে নারীর নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে খুব স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তুলির টানে নারীদের যে চিত্র অঙ্কিত হয় সেই নারীদের গায়ে জড়ানো থাকে অবহেলিত মার্কা পাড়ের আর অত্যাচারিত গোছের শাড়ি। লেখকের কলমে নারীরা খুঁজে পেতে চায় সমাজে তাদের অধিকার তাদের মর্যাদাবোধ- তাদের স্বাধীনতা। কিন্তু " বহু বিভাজিত সমাজে বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত পার্থক্য যেহেতু পীড়নের হাতিয়ার, নারীর অবস্থান সব দিক দিয়ে প্রান্তিকায়িত।.... প্রকৃতপক্ষে নারীর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে থাকে পুরুষের সঙ্গে তার আপেক্ষিক সম্পর্কের বিচারে।..... তাই নারী সত্তাগত বিচারে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সে মিথ্যা, সে মায়া, সে চিররিক্ত, সে শূন্য। তেমনি নারী মানে সে সেবা দিয়ে পুষ্ট করে। নারীর প্রতিশব্দ স্ত্রী মানে যে বেষ্টন করে থাকে।"[২]

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে নারীচরিত্র অনেকাংশে আদর্শবাদী ও নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকে এসে এই চরিত্রগুলি ক্রমশ বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। নারীজীবনের সামাজিক সংকট, ব্যক্তিসত্তার প্রশ্ন এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সাহিত্যিকদের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের ধারায় সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিতে নারীচরিত্র কেবল পারিবারিক সম্পর্কের অংশ নয়; বরং তারা সমাজবাস্তবতার এক সক্রিয় প্রতিনিধি। সন্তোষ কুমারের সাহিত্য "....সেই সব দুঃস্বপ্নের নিষ্পদীপ, পণ্যমূল্যের উল্লম্ফণ, মন্বন্তর, পাষাণ পথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষ, ভিখারি, দলে দলে নারীর পিছনে নিছক লোভাতুর শরীর শিকারি। অর্থনীতির আণবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছিল, জীবনকে যদি একটা সংগ্রাম বলি তাহলে তার রণাঙ্গন জুড়ে ঘটেছিল সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।"[৩] সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে জীবনানুভূতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর পিতা সুরেশচন্দ্র ঘোষ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সংসারের আর্থিক দায়িত্ব অনেকাংশে এসে পড়ে তাঁর মা সরযূবালা দেবীর উপর। সরযূবালা দেবী ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা নারী। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি সংসার সামলেছেন এবং সন্তানদের মানুষ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা সন্তোষকুমার ঘোষের মনে নারীর শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাঁর সাহিত্যেও নারীচরিত্র অনেক সময় দৃঢ়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং সংগ্রামী রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

'কিনু গোয়ালার গলি' সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম উপন্যাস এবং তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই উপন্যাসে নীলা, শান্তি এবং শকুন্তলা—এই তিনটি নারীচরিত্র কাহিনির কেন্দ্রে অবস্থান করে। সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি'-তে নারীচরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখক যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সন্তোষকুমার ঘোষ এখানে কাহিনির বিন্যাসই এমনভাবে গঠিত যে, প্রতিটি খণ্ড-কাহিনির কেন্দ্রে অবস্থান করছে একটি করে নারীচরিত্র, এবং সেই নারীচরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতেই কাহিনির বিকাশ ঘটেছে। নীলা, শান্তি ও শকুন্তলা—এই তিনটি চরিত্র কেবল কাহিনির অক্ষ নয়, বরং তারা প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র মানসিক জগত ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে।

নীলার কাহিনি দিয়ে উপন্যাসের সূচনা এবং সমাপ্তি—এই বিন্যাস থেকেই বোঝা যায় যে, লেখক তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নীলা মধ্যবিত্ত পরিবারের এক শিক্ষিতা, অবিবাহিতা তরুণী; তার জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও বর্তমান বাস্তবতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মূল সুরটি নির্মিত হয়েছে। নীলার অতীতচারণায় যেমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক—সৌম্য, মনন ও মনীশের স্মৃতি—উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি পারিবারিক পরিসরও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে, শান্তি ও শকুন্তলার অতীতজীবনের বর্ণনা নীলার কাছেই ব্যক্ত হওয়ায় তাদের অভিজ্ঞতাও একান্তভাবে নারীসত্তার স্বীকারোক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই তিনটি নারীচরিত্রের মধ্যে একটি লক্ষণীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। যদিও নীলা, শান্তি ও শকুন্তলার সামাজিক অবস্থান ও মানসিক গঠন ভিন্ন—নীলা এক তরুণী শিক্ষিতা মেয়ে, শান্তি বিবাহিত অথচ জটিল দাম্পত্যজীবনের মধ্যে আবদ্ধ নারী এবং শকুন্তলা এক বিবাহবিচ্ছিন্না কর্মজীবী নারী—তবুও তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই লেখক আধুনিক নারীর এক নতুন চেহারা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নীলা চরিত্রটি উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী নির্মাণ। পল্লার পার্কের মুক্ত, স্বচ্ছন্দ জীবনের স্মৃতি তার মধ্যে রয়ে গেলেও, বর্তমানের কঠোর বাস্তবতা তাকে এক পরিণত, অভিজ্ঞ যুবতীতে রূপান্তরিত করেছে। কিনু গোয়ালার গলির সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন

পরিবেশ তাকে গ্রাস করতে পারেনি; বরং তার শিক্ষা ও রুচিবোধ তাকে আলাদা করে রেখেছে। এই কারণেই শান্তির জুয়াখেলার মতো আচরণ বা তার জীবনযাপনের ধরন নীলার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

ইন্দ্রজিতকে কেন্দ্র করে নীলার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তির প্রভাব থেকে ইন্দ্রজিতকে উদ্ধার করার সংকল্প থেকেই নীলার প্রেমের সূত্রপাত। ফলে এই প্রেম কোনো শারীরিক আকর্ষণ বা প্রতিযোগিতার ফল নয়; বরং তা এক সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা থেকে উদ্ভূত। সমালোচকদের মতে এই সম্পর্ককে 'অকারণে যৌন প্রতিযোগিতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও, নীলার চরিত্র বিশ্লেষণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইন্দ্রজিতকে স্বাভাবিক জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাই তার প্রেমের মূল প্রেরণা।

এই প্রসঙ্গে নীলার কর্মকাণ্ড বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—সে ইন্দ্রজিতের রুচির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চায়, তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়, এমনকি নিজের আংটি বিক্রি করে তার জন্য টনিক কিনে আনে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নীলার প্রেম এক গভীর মানবিক দায়বদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়।

তবে উপন্যাসের পরিণতিতে নীলার আত্মমর্যাদাবোধই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ইন্দ্রজিত শান্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে গেলে, নীলা তার প্রতি কোনো আপস করে না। এমনকি গর্ভে ইন্দ্রজিতের সন্তান ধারণ করেও সে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে— "এ লজ্জা যতোই দুস্তর হোক, প্রণয়হীন দাম্পত্যজীবনের নিরন্তর বিড়ম্বনার চেয়ে তো ভালো।"[৪] (পৃ. ২০২) এই সিদ্ধান্ত নীলার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও স্বাধীনচেতা মনোভাবকে স্পষ্ট করে। একইভাবে, অবিনাশবাবুর প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করে এবং শকুন্তলার সঙ্গে থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ বেছে নেয়। যদিও উপন্যাসে তার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠার চিত্র নেই, তবুও তার স্বাবলম্বী হওয়ার সংকল্পই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

অন্যদিকে, শকুন্তলা চরিত্রটি উপন্যাসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধের প্রতীক। একজন নার্স হিসেবে তার পেশাগত জীবন এবং 'নার্সেস হোম' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন—এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গীতা, স্টেলা, অণিমা ও ললিতার মতো কর্মজীবী নারীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক উপন্যাসে এক নতুন সামাজিক মাত্রা যুক্ত করেছে। তারা সকলেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও, সেই স্বাবলম্বন সীমাবদ্ধ; ফলে 'মাসান্তে মাইনে নয়, স্বাধীন জীবিকা' —এই আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

শকুন্তলার স্বপ্নের পেছনে কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়, আত্মসম্মানবোধও কাজ করে— "ডাক্তার উপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে সম্মান, যে স্বীকৃতি এই মেয়েরা পায় নি, এদের সেই জীবনের খোঁজ দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শকুন্তলা।"[৫] (পৃ. ৮৯) এই উক্তি তার মানসিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বগুণকে প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত জীবনে সে এক ব্যর্থ দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, কারণ তার কাছে আত্মসম্মান ও শারীরিক-মানসিক পূর্ণতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের শেষে 'সেবাসত্র' ভেঙে গেলেও তার স্বপ্ন ভেঙে যায় না— "সেবাসত্রের স্বপ্ন আমার শেষ হয় নি ভাই, মনের জোর এখনো আছে। তবে দিনকতক একটু জিরিয়ে নেব।"[৬] (পৃ. ২০৯) এই মনোভাব তাকে এক অদম্য সংগ্রামী নারীতে পরিণত করে।

শান্তি চরিত্রটি নীলা ও শকুন্তলার থেকে ভিন্ন। সে স্বামীকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করলেও, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের নীরব প্রত্যাখ্যান বজায় রাখে। তার জীবনযাপন, মানসিকতা এবং সম্পর্কের জটিলতা—সবকিছুই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নগরজীবনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকটকে প্রতিফলিত করে। ফলে শান্তি চরিত্রটি এক ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

নারীচরিত্রগুলির এই গভীর ও বহুমাত্রিক নির্মাণের বিপরীতে পুরুষ চরিত্রগুলি তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ। যদিও স্বল্প পরিসরে তাদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত হয়েছে, তবুও তারা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠেনি। নীলার বাবা শিবব্রতবাবু, দাদা দেবব্রত, কিংবা অবিনাশবাবুর মতো চরিত্রগুলি 'টাইপ চরিত্র' হিসেবে চিহ্নিত হলেও, তারা উপন্যাসের সামগ্রিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণস্বরূপ, শিবব্রতবাবুর নিষ্ক্রিয়তা, দেবব্রতের স্বার্থপরতা বা অবিনাশবাবুর লোলুপতা—এসবই নারীচরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্যকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। অবিনাশবাবু সম্পর্কে নীলার দৃষ্টিভঙ্গি— "কোন ক্ষতি তো করতে পারবে না, দু'একখানা গান শুনবে, সিনেমায় নিয়ে আসতে পারলে কৃতার্থ হবে, এসে আদা মেশানো চা খেতে চাইবে। তার বেশি কী।"[৭] (পৃ. ২৫০)—চরিত্রটির প্রকৃত স্বরূপকে এক তীক্ষ্ণ রসিকতার মাধ্যমে উন্মোচিত করে।

অতএব, 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে নারীচরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে সন্তোষকুমার ঘোষ এক নতুন যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। নীলা, শকুন্তলা ও শান্তি—এই তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক নারীর স্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও মানসিক জটিলতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই উপন্যাসে নারী কেবল কাহিনির অংশ নয়; বরং তারাই কাহিনির নির্মাতা, নিয়ন্ত্রক এবং অর্থবাহী শক্তি—যার ফলে এই রচনা বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের নানা সমস্যা এবং নারীর মানসিক জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করার প্রবণতা দেখা যায়।

এই উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলি কেবল পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা সমাজের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার প্রতিফলন।

'সুধার শহর' উপন্যাসে সন্তোষকুমার ঘোষ কর্মজীবী নারীর আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সুধা এবং অতসী চরিত্র দুটি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি। এই উপন্যাসে দেখা যায় যে নারীরা কেবল পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে না; বরং তারা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস সুধার শহর (প্রথম নাম 'মোমের পুতুল)—এ নগরজীবনের যে রূপটি চিত্রিত হয়েছে, তা কেবল একটি ভৌগোলিক বা স্থানিক পরিসরের বিবরণ নয়; বরং কলকাতা এখানে এক জীবন্ত, সক্রিয় ও প্রভাবশালী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার যে অবক্ষয়, মূল্যবোধের ভাঙন, নৈতিক সংকট ও মানসিক বিকৃতি—এই সমস্তই উপন্যাসে এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, শহরটি যেন নিজস্ব এক স্বভাব, প্রবণতা ও চরিত্রগুণসম্পন্ন সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই কলকাতা কেবল পটভূমি নয়; বরং উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনে এক বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে উপস্থিত। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রত্যেক চরিত্রকে এই শহরের সঙ্গে আপস করতে হয়—কেউ তাকে গ্রহণ করে নতুন জীবন গড়তে চায়, কেউ তার চাপে ভেঙে পড়ে, আবার কেউ পালিয়ে বাঁচার পথ খোঁজে। ফলে কলকাতা এখানে এক দ্বিমুখী শক্তি—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সম্ভাবনা ও বিপর্যয়ের সম্মিলিত রূপ।

এই প্রেক্ষিতে সুধা চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে শেয়ালদা স্টেশন, আলোকোজ্জ্বল শহর, ভিড়, কোলাহল—সবকিছুই তার কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও, সেই মোহ খুব দ্রুতই কাটে। "এই মাটি হারানো আকাশ খোয়ানো শহরটাকে।"[৮] (পৃ. ৮১) তার ভালো লাগে না—এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শহরের প্রতি তার প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অস্বীকার সম্পূর্ণ নয়; বরং এর মধ্যেই নিহিত থাকে এক ধরনের দ্বৈততা। নিশীথ ডাক্তারের দেওয়া চকোলেট গ্রহণ করার ঘটনাটি প্রতীকীভাবে কলকাতাকে গ্রহণ করার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ক্রমশ সুধা নিজেকে এই শহরের অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে—বাবা নীরদের গ্রাম্য আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ তার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আবার যখন সে গ্রামে ফিরে যায়, তখন সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। উপন্যাসের শেষে তার এই উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই শহরকেই একদিন আপন করে নিতে হবে। ফলে সুধার চরিত্রে কলকাতার প্রতি বিরোধিতা থেকে গ্রহণ—এই মানসিক রূপান্তর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অতসী চরিত্রের মধ্যেও কলকাতার প্রভাব ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনের নানা অপমান ও বঞ্চনার জন্য সে কলকাতাকেই দায়ী করে— "এই শহরটা তার সব কেড়ে নিয়েছে একে একে।"[৯] (পৃ. ৭৬) এই উক্তির মধ্যে দিয়ে শহরের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। কিন্তু লক্ষণীয়, এই ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায় না। বরং অসুস্থ নীলাদ্রিকে নিয়ে এই শহরেই নতুন করে বাঁচার সংকল্প গ্রহণ করে। ফলে অতসীর ক্ষেত্রে কলকাতা একদিকে ধ্বংসের প্রতীক, অন্যদিকে বেঁচে থাকার অনিবার্য ক্ষেত্র।

উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে সুধার উক্তি— "হয়ত এই শহরটাকে আমরা একদিন আপন করে নিতে পারব।"[১০] (পৃ. ২৮৯)—এই দৃষ্টিভঙ্গিরই সামষ্টিক রূপ। এখানে 'আমি' নয়, 'আমরা' —এই শব্দপ্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই 'আমরা'-র মধ্যে সুধা, অতসী ও নীলাদ্রি—সবাই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শহরের সঙ্গে সম্পর্কটি কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি একটি সম্মিলিত অস্তিত্বসংকট ও অভিযোজনের অভিজ্ঞতা।

অন্যদিকে, নূপুর চরিত্রটি কলকাতার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার প্রতীক। নিশীথের প্রতারণা এবং ডাক্তার চৌধুরীর দ্বারা তার মায়ের শোষণ—এই অভিজ্ঞতাগুলি তাকে কলকাতার প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ করে তোলে। অভিজাত পতিতালয়ের 'পাইকারি মাসিমা' হয়ে ওঠার অপমানজনক বাস্তবতা তাকে শহর ত্যাগে বাধ্য করে। ফলে নূপুর ও তার মা কলকাতা ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কলকাতা এক নির্মম, শোষণমুখী শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, যেখান থেকে মুক্তিই একমাত্র পরিত্রাণ।

নীরদ চরিত্রের মধ্যেও কলকাতার আরেকটি ধ্বংসাত্মক দিক প্রকাশিত হয়েছে। পালাকার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর নীরদ সংসারকে উপেক্ষা করে, এমনকি নিজের সন্তানকেও বিসর্জন দেয়। কিন্তু তার সেই স্বপ্নও শেষ পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়—তার লেখা পালা অন্যের হাতে পরিবর্তিত হয়ে থিয়েটারের রূপ নেয়। "শুধু নাম, শুধু মলাট। পড়ে দেখ, ওরা সব বদলে দিয়েছে।"[১১] (পৃ. ২৩৯)—এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, কলকাতা কেবল মানুষের বর্তমান নয়, তার স্বপ্ন ও সৃষ্টিকেও কেড়ে নেয়।

এইভাবে উপন্যাসটির বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, কলকাতা এখানে এক বহুমাত্রিক চরিত্র—যে simultaneously আকর্ষণ করে, ধ্বংস করে, রূপান্তরিত করে এবং কখনো কখনো আশ্রয়ও দেয়। ফলে শহরটি কেবল প্রেক্ষাপট নয়; বরং কাহিনির সক্রিয় নিয়ন্ত্রক শক্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় সন্তোষকুমার ঘোষের অন্যান্য উপন্যাসেও। 'কিনু গোয়ালার গলি' ও 'সুধার শহর'—এই দুই উপন্যাসে তিনি সমাজ ও সময়কে প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসসমূহে—যেমন 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে'—এ তিনি কাহিনিনির্ভরতা থেকে সরে এসে ব্যক্তিক ও আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার উপর অধিক জোর দিয়েছেন। তবুও এই রচনাগুলিতে সমকালীন সমাজ, মফস্ফল জীবন, কলকাতা শহর এবং অর্থনৈতিক সংকটজনিত পারিবারিক ট্র্যাজেডির চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়া 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের বিকাশকে সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা লেখকের সময়সচেতনতার আরেকটি দৃষ্টান্ত।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর সময়, 'আমার সময়' (প্রকাশকাল ১৯৭২) উপন্যাসটি, যেখানে একাত্তরের নকশালপন্থী আন্দোলনে উত্তাল কলকাতার রূপ শিল্পরূপে ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসে লেখক আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব ও বিপর্যয়কে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এক রক্তাক্ত সময়ের চিত্র এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অতএব, সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসসমূহে সমাজ ও সময়চেতনা এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বিশেষত 'সুধার শহর'-এ কলকাতাকে যে জীবন্ত চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে, তা বাংলা উপন্যাসে নগরজীবনের চিত্রায়ণে এক অনন্য সংযোজন। এই শহর কখনো প্রতিপক্ষ, কখনো নিয়ন্তা, কখনো আশ্রয়—কিন্তু সর্বোপরি, এটি মানুষের জীবনসংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পগুলিতে নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রথম' গল্পে দময়ন্তী চরিত্রের মাধ্যমে মাতৃত্বের গভীর আবেগ এবং মানসিক জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মাতৃত্ব কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি ব্যক্তিগত অনুভূতির একটি গভীর অভিজ্ঞতা। 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পে নিরুপমা চরিত্রটির মাধ্যমে নারীর বয়স, স্মৃতি এবং জীবনের উপলব্ধি নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পগুলিতে নারীচরিত্র মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পবিশ্বে নারী কেবল সহায়ক চরিত্র নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু, মানসিক জটিলতার আধার এবং সামাজিক বাস্তবতার সূক্ষ্ম প্রতিফলন। তিনি নারীকে একরৈখিকভাবে দেখেননি; বরং প্রেম, দাম্পত্য, সামাজিক অবদমন, মানসিক বিকার, একাকিত্ব, আত্মসম্মান ও অস্তিত্বসংকট—এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারীচরিত্রকে বহুস্তরীয় রূপে নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর ছোটগল্পের নারীচরিত্রগুলি বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে।

প্রথমত, সন্তোষকুমার ঘোষের নারীচরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা। তাঁর নারীচরিত্ররা বাহ্যিক ঘটনাবলির চেয়ে অধিকতরভাবে নিজেদের অন্তর্জগতে বসবাস করে। যেমন 'কস্তুরীমৃগ' গল্পে নির্মলা চরিত্রটি সমাজস্বীকৃতি-বঞ্চিত প্রেমের এক মর্মান্তিক প্রতীক। অধ্যাপক অজয়ের প্রতি তার ভালোবাসা নিঃশব্দ, গোপন এবং সামাজিকভাবে অগ্রাহ্য। অজয়ের মৃত্যুর পর তার শোক প্রকাশের অধিকারও নেই—এই দমনই তার চরিত্রের করুণতম দিক। সে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখতে বাধ্য, অথচ সেই লুকোনো ভালোবাসাই তার অস্তিত্বের মূল। এই নির্মলার মধ্যে আমরা দেখি—নারীর অনুভূতির সামাজিক অস্বীকৃতি এবং সেই কারণে জন্ম নেওয়া গভীর নিঃসঙ্গতা।

দ্বিতীয়ত, তাঁর নারীচরিত্রে প্রেমের জটিলতা ও দ্বৈততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে লীলা চরিত্রটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লীলার মধ্যে প্রেম, আকর্ষণ, দ্বিধা, ঘৃণা, সামাজিক বোধ—সব মিলিয়ে এক জটিল মানসিক টানাপোড়েন কাজ করে। সে একদিকে স্মরজিতের প্রতি আকৃষ্ট, অন্যদিকে তার শারীরিক অসম্পূর্ণতা তাকে বিচলিত করে; আবার অনুপমের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও তাকে প্রভাবিত করে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই লীলার চরিত্র গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা নিছক আবেগ নয়; বরং এক গভীর মানসিক পরিণতির ফল। এখানে নারীকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, স্বনির্ধারক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

তৃতীয়ত, সন্তোষকুমার ঘোষের নারীচরিত্রে সামাজিক বাস্তবতা ও অবদমনের প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট। 'ছাপ' গল্পের মার্থা চরিত্রটি একদিকে প্রেমে অবিচল, অন্যদিকে সামাজিক বাস্তবতায় পতিতাবৃত্তিতে অবতীর্ণ। কিন্তু তার প্রেমবোধ অটুট—সে বাঙালি প্রেমিক শ্যামলকে ভুলতে পারে না এবং তারই প্রতিরূপ খুঁজে বেড়ায় অন্যদের মধ্যে। এই চরিত্রে দেখা যায়—সমাজ নারীর জীবনকে ভেঙে দিলেও তার অন্তর্গত আবেগকে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারে না। একইভাবে 'পারাবত' গল্পে সুলতার দৃষ্টিতে আমরা দেখি প্রেমের অভিনয়—যেখানে প্রেম জীবিকার উপায় হয়ে ওঠে। এখানে নারী প্রত্যক্ষ করে এক ভুয়া আবেগের জগৎ, যা প্রকৃত ভালোবাসার অভাবকে আরও প্রকট করে।

চতুর্থত, তাঁর নারীচরিত্রে দাম্পত্য ও সম্পর্কের সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'শরিক' গল্পে উমা ও নীলিমা—দুই নারীই একই পুরুষকে কেন্দ্র করে আশাহীনতা ও শূন্যতার অভিজ্ঞতায় যুক্ত। আবার 'সমান্তর' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর রুচিভেদের কারণে সম্পর্ক ক্রমশ শূন্য হয়ে যায়। এইসব গল্পে নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়; বরং সম্পর্কের ভাঙনকে অনুভবকারী এবং তা উপলব্ধি করতে সক্ষম এক সংবেদনশীল সত্তা।

পঞ্চমত, সন্তোষকুমার ঘোষ নারীচরিত্রের মধ্যে মানসিক বিকার ও জটিলতার সূক্ষ্ম চিত্রণ করেছেন। 'মনে মনে' গল্পে সুজাতার চরিত্রে দেখা যায় এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান—সে জানে তার কল্পনা বাস্তব নয়, তবুও সেই কল্পনার মধ্যেই বাঁচতে চায়। সুবিমলের প্রতি তার অভিমান, উপলব্ধি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে সে এক জটিল আত্মবিশ্লেষী চরিত্রে পরিণত হয়। একইভাবে 'ঘ্রাণ' গল্পে কৌশলা উপাধ্যায়ের মানসিক জটিলতা বা 'আড়াল' গল্পে নীলিমার আচরণ—সবই নারীর মনের অন্ধকার, অবদমিত স্তরগুলিকে উন্মোচিত করে।

ষষ্ঠত, তাঁর নারীচরিত্রে শরীর ও যৌনতার সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর উপস্থিতি রয়েছে, যা কখনোই স্থূল বা অতিরঞ্জিত নয়। বরং এই যৌনতা মানসিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। 'ছায়াঘর' গল্পে প্রণতির অভিজ্ঞতা বা 'স্ত্রৈণ' গল্পে সম্পর্কের উপলব্ধি—এসব ক্ষেত্রে শরীরী অনুভূতি এক গভীর মানসিক সত্যকে প্রকাশ করে। লেখক এখানে যৌনতাকে কখনোই প্রদর্শনের বস্তু করেননি; বরং মানবমনের জটিলতার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

সপ্তমত, সন্তোষকুমার ঘোষের নারীচরিত্রে অস্তিত্বসংকট ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক নারীচরিত্রই নিজের অবস্থান, সম্পর্ক ও জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকে। তারা সমাজের নিয়ম মেনে চলে, আবার সেই নিয়মের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধও গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ কখনো প্রকাশ্য নয়; বরং অন্তর্মুখী, মানসিক।

তাই বলা যায়, সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পের নারীচরিত্রগুলি একাধারে সংবেদনশীল, জটিল, আত্মবিশ্লেষী এবং বাস্তবজীবনের গভীর সত্যের প্রতিফলক। তারা নিছক প্রেমিকা, স্ত্রী বা ভুক্তভোগী নয়; বরং তারা চিন্তাশীল, দ্বন্দ্বময় এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটল এক স্বতন্ত্র মানবসত্তা। প্রেম, সমাজ ও মানসিকতার সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে এই নারীচরিত্রগুলি লেখকের সাহিত্যকে করেছে গভীর ও বহুমাত্রিক। ফলে বাংলা ছোটগল্পে নারীচরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সন্তোষকুমার ঘোষের অবদান নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তাঁর নারীচরিত্রগুলি সমাজের পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রতিফলন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাঙালি সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। শিক্ষার প্রসার, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং ব্যক্তিসত্তার সচেতনতা নারীর জীবনকে নতুন মাত্রা দেয়। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অন্যদিকে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে মাতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত। তাঁর বহু রচনায় মাতৃত্ব কেবল পারিবারিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি মানবিক মূল্যবোধের এক গভীর উৎস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে' গ্রন্থে তিনি তাঁর মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এক গভীর আত্মস্বীকারোক্তিমূলক পত্র-আখ্যান, যেখানে পত্রলেখক পুত্র তার মায়ের প্রতি নিবেদিত আবেগ, শ্রদ্ধা, অনুশোচনা ও আত্মসমীক্ষার জটিল অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ এখানে কেবল একটি চিঠির কাঠামো ব্যবহার করেননি; বরং সেই চিঠির মধ্য দিয়ে মা-ছেলের সম্পর্ককে এক বহুমাত্রিক বাচনভঙ্গিতে উন্মোচিত করেছেন। ফলে এই রচনা একাধারে আত্ম-অন্বেষণ ও মাতৃ-অন্বেষণের এক বিরল শিল্পদলিল।

প্রথমত, আখ্যানের কথনরীতির দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—যেহেতু এটি একটি চিঠি, তাই স্বাভাবিকভাবেই কথক উত্তমপুরুষের জবানিতে কথা বলবে। কিন্তু এখানে কথকের অবস্থান একরৈখিক নয়। আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে— "The narrator, it referred to by a pronoun, is always 'I', even when we are persons s/he speaks of are 'I', 'he', 'she', 'we', 'you' etc."[১২] অর্থাৎ কথক সর্বদাই এক অর্থে 'আমি। এই উপন্যাসেও পত্রলেখক সেই 'আমি-এর অবস্থানেই রয়েছে, কিন্তু তার বাচনে ক্রমাগত 'সে , 'আমি' ও 'তুমি'-র রূপান্তর ঘটে। এই পরিবর্তন কেবল ভাষাগত নয়; এটি মানসিক দূরত্ব ও নৈকট্যের এক সূক্ষ্ম শিল্পরীতি।

উপন্যাসের সূচনায়ই আমরা দেখি—

"তার প্রথম চিঠি "শ্রীচরণেষু মা!" চিঠি লিখে লিখে তামাম শোধের যে-খেলায় সে নেমেছে, তার প্রথম চিঠি মাকে লেখাই তো ভাল।..."[১৩] (পৃ.৪৫)

এখানে 'তার' এবং 'সে' সর্বনামের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পত্রলেখক নিজেকেই তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করছে, ফলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও এক ধরনের দূরত্ব তৈরি করছে। এই দূরত্ব আসলে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনীয় শর্ত—নিজেকে যেন বাইরে থেকে দেখার চেষ্টা। কিন্তু এই দূরত্ব স্থায়ী নয়। অল্প পরেই সে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ সম্বোধনে—

"শ্রীচরণেষু মা, সম্বোধনে এই পাঠটা লিখেই তোমার যে ছবিটা ফুটে উঠেছে, সেটা বাঁধানো, টাঙানো, প্রায় জীর্ণ একটি বয়সের ফটো মাঝে মাঝে যাতে স্মরণ দিনে মালাটালা ঝুলিয়ে দিই।"[১৪] (পৃ.৪৭)

এখানে 'ঝুলিয়ে দিই —এই ক্রিয়াপদের মধ্য দিয়ে 'আমি'-র প্রত্যাবর্তন ঘটে। কিন্তু এই 'আমি' নিজের কথা বলছে না; বলছে 'তুমি'-কে কেন্দ্র করে—অর্থাৎ মাকে কেন্দ্র করে। ফলে আখ্যানটি এক অনন্য ত্রিমাত্রিকতায় গঠিত হয়— 'সে (দূরত্ব), 'আমি' (আত্মপ্রকাশ), 'তুমি' (মাতৃসম্বোধন)।

এই বাচনরীতির মধ্যেই মায়ের প্রতি পুত্রের গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের ভিত্তি নির্মিত হয়। মা এখানে কেবল চিঠির প্রাপক নন; তিনি আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং পুত্রের মানসিক জগতের প্রধান আশ্রয়। পত্রলেখক নিজেই স্বীকার করে—সে বহু দেবতার উপাসক, বহু সম্পর্কের জটিলতায় আবদ্ধ; কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিমার মধ্যে প্রথম প্রতিমা তার মা—

"যত পুতুল আর প্রতিমা আজ সুদূর-উদ্ভাসে ঝাপসা চোখে ধরা দিলে তার প্রথমটি মা হবেন না তো কে!"[১৫] (পৃ.৪৫)

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে মায়ের প্রতি তার চরম শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। মা এখানে জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রতিমা—যার কাছে ফিরে এসে সে নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতার হিসাব দিতে চায়।

দ্বিতীয়ত, আখ্যানতাত্ত্বিক দিক থেকে এই উপন্যাসের কথক একজন অটোডাইজেটিক কথক—অর্থাৎ সে নিজের জীবনকাহিনি নিজেই বলছে। কিন্তু এই আত্মকথন নিছক আত্মপ্রদর্শন নয়; বরং আত্মসমালোচনা ও আত্মশোধনের এক প্রক্রিয়া। সে নিজেই বলেছে—সে "তামাম শোধের" খেলায় নেমেছে। এই শোধের প্রক্রিয়ায় মা-ই তার প্রধান বিচারক ও শ্রোতা।

এখানে শ্রোতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত আখ্যানতত্ত্বে কথকের গুরুত্ব বেশি হলেও, এই উপন্যাসে শ্রোতা—অর্থাৎ মা—সমানভাবে সক্রিয়। কারণ, প্রতিটি অংশেই পত্রলেখক মাকে সম্বোধন করছে—কখনও সরাসরি 'মা' , কখনও 'তুমি'। এই নিরন্তর সম্বোধন মায়ের উপস্থিতিকে জীবন্ত করে তোলে। ফলে মনে হয়, সে যেন দূরে বসে চিঠি লিখছে না; বরং মায়ের সামনে বসে মুখোমুখি কথোপকথন করছে।

যেমন— "আচ্ছা, আমিই একটু খেই ধরিয়ে দিচ্ছি। বাবার, একটা চিঠি এল, মনে পড়ছে এবার? কতদিন পরে, কতদিন পরে, মা?"[১৬] (পৃ.১০৩)

এখানে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি, স্মৃতি উসকে দেওয়ার চেষ্টা—সব মিলিয়ে এটি এক প্রত্যক্ষ সংলাপের আবহ তৈরি করে। আবার—

"মা, এই দেখো মা, আমি ফিরে এসেছি। মা, আমার পকেটে বাজছে, অনেকগুলো টাকা, কিন্তু ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন তুমি, তোমার চোখ জ্বল জ্বল করছে, তুমি কি ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলবে "দে, দে, দে" বলে কেড়ে নেবে?"[১৭] (পৃ.১৮১)

এই অংশে আবেগের তীব্রতা, পুনরুক্তি ('মা, এই দেখো মা')—সবকিছু মিলিয়ে মায়ের প্রতি এক গভীর আকুলতা ও মানসিক নির্ভরতার প্রকাশ ঘটে। এখানে মা কেবল স্মৃতির চরিত্র নন; তিনি জীবন্ত উপস্থিতি, যার প্রতিক্রিয়া পুত্র কল্পনা করছে।

তৃতীয়ত, এই উপন্যাসে আত্ম-অন্বেষণ ও মাতৃ-অন্বেষণ সমান্তরালভাবে চলে। পত্রলেখক নিজের জীবনের দুঃখ, ব্যর্থতা, অভিমান, অপরাধবোধ—সবকিছুর হিসাব দিতে চায় মায়ের কাছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে মাকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চায়—মায়ের

জীবন, তার অভিজ্ঞতা, তার ত্যাগ, তার নীরবতা—সবকিছুকে বুঝতে চায়। ফলে মা এখানে কেবল স্মৃতির অবলম্বন নন; তিনি এক অনুসন্ধানের বিষয়।

এই অনুসন্ধানের ফলেই আখ্যানের মধ্যে মধ্যমপুরুষের ('তুমি') এক বিশেষ উপস্থিতি তৈরি হয়। উত্তমপুরুষের আখ্যানের মধ্যেই যেন 'You-narrative'-এর একটি স্বতন্ত্র স্তর গড়ে ওঠে। পুত্র যখন মাকে সম্বোধন করে তার জীবনের কথা বলে, তখন সেই 'তুমি' ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে পরিণত হয়।

এই দিক থেকে এই উপন্যাসটির সঙ্গে রেণু, তোমার মন-এর একটি সম্পর্ক স্মরণযোগ্য। যদিও সেখানে সম্পূর্ণ মধ্যমপুরুষে আখ্যান নির্মিত, এখানে তা আংশিকভাবে ব্যবহৃত—কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। কারণ, এই 'তুমি' সম্বোধনের মধ্য দিয়েই মায়ের প্রতি আবেগ, শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতা সর্বাধিক তীব্র হয়ে ওঠে।

অতএব, বলা যায়—শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে উপন্যাসে মায়ের প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে বহুমাত্রিক আখ্যানরীতির মাধ্যমে। 'সে, 'আমি' ও 'তুমি'-র পারস্পরিক বিন্যাস, কথক ও শ্রোতার সমান্তরাল অবস্থান, এবং আত্ম-অন্বেষণ ও মাতৃ-অন্বেষণের যুগল প্রক্রিয়া—সব মিলিয়ে এই রচনা এক অনন্য আবেগঘন সাহিত্যকীর্তি। এখানে মা কেবল একটি সম্পর্ক নয়; তিনি পুত্রের জীবনের প্রথম প্রতিমা, বিচারক, আশ্রয় এবং আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত কেন্দ্র।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সন্তোষকুমার ঘোষ এমন এক সাহিত্যিক যিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবধর্মী এবং মানবিক। বিশেষত নারীচরিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই কারণে তাঁর সাহিত্য বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্রের উপস্থিতি তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি, মাতৃপ্রভাব এবং সমকালীন সমাজবাস্তবতার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে তাঁর নারীচরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী, মনস্তাত্ত্বিকভাবে জটিল এবং মানবিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই কারণে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উৎসনির্দেশ—

১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্দ্দশ খন্ড প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা-৬৪০।

২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, ২০১০, পৃষ্ঠা-৫১ ।

৩. সন্তোষকুমার ঘোষ, এই বাংলা, দেশ- সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮।

৪. সন্তোষকুমার ঘোষ, 'কিনু গোয়ালার গলি', দিগন্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৫০, পৃষ্ঠা-২০২ ।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯ ।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৯ ।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫০ ।

৮. সন্তোষকুমার ঘোষ, 'সুধার শহর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃষ্ঠা- ৮১ ।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৬ ।

১০.তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৯ ।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩৯ ।

১২. Monika Fludernik, 'An Introduction to Narratalogy'. London and New York, Routledge, 2009, page- 32.

১৩. সন্তোষকুমার ঘোষ, 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭১, পৃষ্ঠা- ৪৫ ।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭ ।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫ ।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৩ ।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮২ ।

Copyright & License:
© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.